ফাদার আঁতোয়ান এবং তুলনামূলক সাহিত্য-বিভাগ

নরেশ গুহ

শেষ যেদিন বাক্যালাপ সম্ভব হয়েছিলো, ফাদার আঁতোয়ানকে খুবই বিচলিত দেখেছিলাম। সঙ্গত কারণ ছিলো বিচলিত হওয়ার। ভেবেছিলেন যে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতেও মাস ছয়েক সময় হাতে পেয়ে যাবেন, অন্তত দু-মাস— যার মধ্যে শেষ করে যেতে পারবেন রামায়ণ বিষয়ক গবেষণার শেষ পরিচ্ছদটি। কিন্তু ক্রমে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে সেটা হবার নয়। মুখে-মুখে বলে গেলে কেউ কি লিখে নিতে পারে না, জিজ্ঞেস করেছিলাম। উৎসাহ দেখাননি। উঠে আসার আগে— যা কখনো করতে দেখিনি— হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ 'Thirty years together, Naresh, we were thirty years together.' এই প্রথম তাঁর গলা আবেগে কেঁপে গেলো। সন্ন্যাসীর গলাও কেঁপে যায় মৃত্যুকে অকস্মাৎ মুখোমুখি দেখতে পেয়ে।

আমাদের অতি বড়ো সুহৃদ ছিলেন ফাদার আঁতোয়ান। ত্রিশ বছর ধরে আমাদের পরিচয় গাঢ় হয়েছিলো। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ফাদার ফালোঁর সঙ্গে তিনি আমাদের মধ্যবিত্ত পাড়ায় উঠে আসেন, বাঙালি সমাজে বাস করতে। এসেই তাঁদের অপরিসর বাসগৃহে তাঁরা ছোটোখাটো একটা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসলেন, অবৈতনিক। (বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা আমার দেওয়া)। বন্ধুবান্ধব মিলে অনেকেই আমরা সেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়লাম। বয়সে বড়োদের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত নিয়মিত খাতাপেনসিল নিয়ে হাজির হতেন বুদ্ধদেব বসু। উপলক্ষ ছিলো ফরাসি ভাষা শেখা। ব্যাকরণ গিলে নয়, একবারেই সোজাসুজি বোদলেয়ার, মালার্মে, ভেরলেইন আর ভালেরি, পাস্কাল আর ভোলতেয়ারের স্বাদ পেতে-পেতে ইঙ্গ সংস্কৃতি সাম্রাজ্যের বাইরে বেরিয়ে এসে খাস ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। দেখতে দেখতে আমাদের মনের এবং কানের অভ্যাসের মধ্যে একটা দারুন ওলটপালট ঘটে গেলো। অনেক মানসিক দড়িদড়া ছিঁড়ে যেতে লাগলো আমাদের। আমরা মনের জগতে অনাস্বাদিত এক স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম। ফাদার আঁতোয়ানের সঙ্গে আমাদের বন্ধুতার এই ভূমিকা। এই ক্লাস বেশিদিন চলেনি। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই আসরের বিষয়ে অনেকেই কিছু জানেনও না। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে মানতেই হয় যে বাংলা সাহিত্য এবং শিক্ষাব্যবস্থার উপর দুই বেলজিয়ান সন্ন্যাসীর এই প্রয়াসের প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো।

এর অল্পদিন পরেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় বোদলেয়ার অনুবাদ শুরু করেন, তরুণ কবিদের ওপর যে-সব রচনার প্রভাব অনস্বীকার্য। আর প্রায় সেই সঙ্গেই স্থাপিত হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানকার তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ। ভারতবর্ষে এই প্রথম জাতীয় সাহিত্যের পাশাপাশি খুলে গেলো বিশ্বসাহিত্য পাঠের দরজা-জানলা। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কারো এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলো না। তিনি তাঁর সহকর্মী হিসেবে যাঁদের সাদরে ডেকে নিলেন তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম প্রধান দুজনের নাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং ফাদার রবের আঁতোয়ান, দুজনেই এখন গত। সুধীন্দ্রনাথ আর ফাদার আঁতোয়ান— দুজনেই ছিলেন বহুভাষাবিদ। বাংলা আর ইংরেজি বিদ্যার সঙ্গে যোগ হয়েছিলো ফরাসি, জার্মান আর সংস্কৃত। ফাদার আঁতোয়ান তার ওপরে যোগ করলেন গ্রিক আর লাতিন, ইতালিয়ান আর স্প্যানিশ। আমরা যেন ভুলে না যাই যে দিক্‌পাল ইংরেজিবিদদের ধিক্কারে বাতাস বহুদিন পর্যন্ত ভারি হয়ে থাকলেও, এই পদ্ধতির সাহিত্যচর্চাকেই শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। কথাটা কোথাও লেখা থাকা দরকার।

অবকাশের অনেকটা অংশই তিনি তাঁর ধর্মীয় প্রতিশ্রুতি কর্মে ব্যয় করেছেন। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁকে অনেক বলতে কইতে হতো, উপদেশ দিতে হতো। মাদার টেরেসার 'নির্মল হৃদয়ে' সপ্তাহে একদিন নিয়মিত হাজির থাকতেন। ভারতীয় রাগরাগিণীতে প্রাণস্পর্শী বাংলা প্রার্থনাগীত রচনা করতেন যা আজ নিয়মিত এ-দেশীয় গির্জাতে গাওয়া হয়। অথচ যাদবপুরে অধ্যাপনা করে তিনি যে আরেক ধরনের গভীর পরিতৃপ্তি পেতেন তা আমাদের কাছে গোপন রাখেননি। ভ্যাটিকানে পোপের দরবারে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নির্বাচন যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলো, আমরা জানি নির্বাচনকালে তাঁকে তালিকায় প্রথম না করে অন্তত যাতে দ্বিতীয় করা হয় তার জন্য কী পরিমাণ ব্যাকুল ছিলেন তিনি। এবং তার একমাত্র কারণ ছিলো অধ্যাপনার প্রতি তাঁর প্রাণের টান।

এই অধ্যাপনার সূত্রেই তাঁর প্রায় সব সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছিলো। তু.সা.-র পাঠক্রমে তাঁর ওপরে আমাদের নির্ভর ছিলো প্রচুর : তুলনামূলক ভাবে তিনি পড়াতেন প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় এবং অনেকটা পরিমাণে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য। হোমার, ওভিদ, দান্তের সঙ্গে ভার নিয়েছেন গ্রিক ট্র্যাজেডি আর সংস্কৃত নাটকের। এছাড়া লাতিন ভাষা শেখাতেন। বুদ্ধদেব বসু অবসর নেবার কয়েক বছর পরে, তাঁর অন্যান্য কাজকর্ম যথাসাধ্য কমিয়ে এনে তিনি পুরো সময়ের জন্য যোগ দিলেন যাদবপুরে, ১৯৬৭ সালে। নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার আদর্শ এবং আগ্রহ থেকেই, যখন যে-বিষয়ে পড়াতেন সে-বিষয়ে আগেই বয়স্কপাঠ্য কোনো প্রবন্ধ রচনা করে ফেলতেন। পরীক্ষার সহায়ক হিসেবে নয়, চর্বিতচর্বণের অসার দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়, সাহিত্যের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা হিসেবে। তিনি পুরো সময়ের জন্য যোগ দেবার পরে বিভাগীয় জার্নালের একটি সংখ্যাও বেরোয়নি যাতে তাঁর লেখা নেই।

ক্লাস-পড়ানোর দায়িত্ব থেকেই তৈরি হয়েছিলো 'যাদবপুর জার্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচর'-এ ছাপা রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি দীর্ঘ রচনা। একত্রিত এবং পুনর্লিখিত হয়ে পরে

'Rama and the Bards' নামে বই বেরোয়। আরও অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে এবং সাম্প্রতিক আলোচনাপদ্ধতি অবলম্বনে, এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য হচ্ছে রামায়ণ গড়ন। রামায়ণ নিয়ে এ ধরনের মৌলিক আর কোনো আলোচনা আমার জানা নেই। তাঁর সহকর্মী সুবীর রায়চৌধুরী 'হীনযান' পত্রিকায় এ-বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। জীবনের শেষ দশক এই রামায়ণ প্রসঙ্গই তাঁর মন জুড়ে ছিলো। এ-বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য গবেষণার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তাঁর শেষ গ্রন্থটি। রোগশয্যা থেকে অশেষ চেষ্টা করেও বইটির সর্বশেষ পরিচ্ছেদ তিনি শেষ করতে পারেননি। সুখের বিষয়, এই অলিখিত অংশের ওপর গ্রন্থের মূল বক্তব্য খুব সম্ভব নির্ভর করছে না। এই পর্যন্ত বললেই আপাতত যথেষ্ট হবে যে ফাদার আঁতোয়ান ছিলেন একেবারেই ভিন্ন মার্গের আলোচক। আদি মহাকাব্যের গড়ন বিষয়ক আলোচনায়, বালকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড কে লিখেছেন, কবে লিখেছেন, সেটা তিনি কোনো দরকারি প্রশ্ন বলেই মানতেন না। বহুস্তর আয়তন সমেত মহাকাব্যের আদ্যোপান্ত সবটুকুই আমাদের স্বীকার্য এই ছিলো তাঁর সিদ্ধান্ত। আসল কথা হচ্ছে— কীভাবে এবং কেন এই কাণ্ডগুলিও সমগ্র রামায়ণের অচ্ছেদ্য অংশ সেইটে আলোচনা করা এবং তিনি করেছেন। অসমাপ্ত শেষ গ্রন্থে তাঁর পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন। সেখানে এক অভিনব উপায়ে তিনি রামায়ণের ছন্দ এবং ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো এই কথা প্রতিপন্ন করা যে প্রত্যাশিতভাবেই এই মহাকাব্যও বহুলাংশে মৌখিক রচনারীতির লক্ষণাক্রান্ত।

যাকে বলি কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিশীল লেখক, তা তিনি ছিলেন না। তাছাড়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনাসূত্রে ধ্রুপদী সাহিত্যের গুণী সমজদার হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন নিজের ধর্মীয় দায়িত্বে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ধর্ম এবং সাহিত্যের মধ্যে বিচ্ছেদ আমাদের কালে প্রায় বুঝি সম্পূর্ণ হয়েছে। তবু তিনি এই দুইয়ের মধ্যে কী করে আশ্চর্য এক সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন আমি জানি না।

মহাকাব্যের আলোচনা করতে করতেই বুদ্ধদেব বসু এবং ফাদার আঁতোয়ানের জীবনাবসান হলো। 'মহাভারতের কথা' লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অসমাপ্ত। ফাদার রবের আঁতোয়ান লিখে গেলেন রামায়ণের কথা। এও অসমাপ্ত। অসমাপ্ত সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা এই যে দুজনেই তাঁরা জীবনের সর্বশেষ কর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ভারতবর্ষীয় দুই মহাকাব্যের আলোচনা এবং দুজনেই অবলম্বন করেছিলেন যে-পদ্ধতি তা তুলনামূলক সাহিত্যের পদ্ধতি। দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি পাড়ায় তিরিশ বছর আগেকার সেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এই পরিণতির সূচনা হয়েছিলো? হয়তো বা তাই।